بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৫ জানুয়ারি ২০২১ মোতাবেক ১৫ সুলাহ্, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত আলী (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল, আজও তাঁর স্মৃতিচারণ অব্যাহত থাকবে আর আমি তাঁর সম্পর্কে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম আজ তা শেষ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"হযরত ইমাম হোসেইন সাহেব (রা.) একবার হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি আমাকে ভালোবাসেন? হযরত আলী (রা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত ইমাম হোসাইন আলাইহিস সালাম এতে খুবই বিস্মিত হন এবং বলেন, এক হৃদয়ে দু'টি ভালোবাসা কীভাবে সহাবস্থান করতে পারে? এরপর হযরত ইমাম হোসেইন আলাইহিস সালাম বলেন,** (তুলনামূলক দৃষ্টিকোন থেকে যদি একজনকে বেছে নিতে হয়) **তাহলে আপনি কাকে ভালোবাসবেন?** {হযরত আলী (রা.) বলেন,} **আল্লাহ্‌কে।"** **(মলফূযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫৭)**

এ ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, "হযরত হাসান (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে একটি প্রশ্ন করেন, আপনি কি আমাকে ভালোবাসেন? হযরত আলী (রা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত হাসান (রা.) পুনরায় প্রশ্ন করেন, আপনি কি খোদা তা'লাকেও ভালোবাসেন? হযরত আলী (রা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত হাসান (রা.) বলেন, তাহলে তো আপনি এক অর্থে শির্ক করছেন। খোদা তা'লার সাথে তাঁর ভালোবাসায় অন্য কাউকে অংশীদার করাকেই তো শির্ক বলা হয়। হযরত আলী (রা.) বলেন, হাসান (রা.)! আমি শির্ক করছি না। আমি নিঃসন্দেহে তোমাকে ভালোবাসি কিন্তু তোমার ভালোবাসা যদি খোদার ভালোবাসার সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ তোমার ভালোবাসা পরিত্যাগ করবো।" **(কুরূনে উলা কি নামওয়ার খওয়াতীন আওর সাহাবিয়াত কে ঈমান আফরোয ওয়াকেয়াত, আনওয়ারুল উলূম, ২১তম খণ্ড, পৃ: ৬২৩)**

এরপর হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে একস্থানে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, **"হযরত আলী (রা.) যখন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখিন হতেন তখন তিনি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এই দোয়া করতেন, يَا كٓهٰيٰعٓصٓ اِغْفِرْلِيْ অর্থাৎ, হে كٓهٰيٰعٓصٓ (খোদা) আমাকে ক্ষমা করে দাও।"** **(তফসীরে কবীর, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৭)**

উম্মে হানী'র এক বর্ণনানুসারে মহানবী (সা.) (কুরআনের) এই মুকাত্তায়াতগুলোর অর্থ করে বলেছেন, 'কাফ' (খোদা তা'লার) 'কাফী' গুণবাচক নামের সংক্ষিপ্তরূপ, 'হা' হাদী গুণবাচক নামের সংক্ষিপ্তরূপ এবং 'আঈন' 'আলেম' বা 'আলীম' গুণের স্থলাভিষিক্ত। আর 'সোয়াদ' 'সাদেক' গুণবাচক নামের সংক্ষিপ্তরূপ। **(তফসীরে কবীর, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৭)**

অর্থাৎ, {তিনি (রা.} আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এই দোয়া করছেন, হে আল্লাহ্! তুমিই কাফী বা তুমিই যথেষ্ট, তুমি হাদী অর্থাৎ পথ-প্রদর্শক, তুমি আলীম অর্থাৎ সর্বজ্ঞানী আর তুমিই সাদেক অর্থাৎ সত্যবাদী। তোমার এসব গুণের দোহাই– তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, "তফসীরকারীরা হযরত আলী (রা.)'র একটি ঘটনাও বর্ণনা করেন যে, তিনি (রা.) একবার তাঁর একজন ভৃত্যকে ডাকেন, কিন্তু সে ডাকে সাড়া দেয় নি। তিনি

(রা.) বারবার ডাকতে থাকেন কিন্তু সে কোন উত্তর দেয় নি। কিছুক্ষণ পর ঘটনাচক্রে সেই বালক বা ভৃত্য তাঁর সামনে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, مَا لَکَ لَمْ تُجِبْنِی তোমার কী হয়েছে যে, আমি তোমাকে এতবার ডাকলাম তবুও তুমি আমার ডাকে সাড়া দিলে না? قَالَ لِثِقَتِیْ بِحِلْمِکَ وَاَمْنِ مِنْ عُقُوْبَتِکَ فَاسْتَحْسَنَ جَوَابَهٗ وَاَعْتَقَهٗ সে বলল, আসল কথা হল, আপনার কোমলতায় আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল আর আপনার শাস্তি থেকে আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করি– তাই আমি আপনার ডাকে সাড়া দেই নি। সেই বালকের উত্তর হযরত আলী (রা.) ভালো লাগে আর তিনি তাকে মুক্ত করে দেন।" **(তফসীরে কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৫৫)**

এখানে কোন জগতপূজারী হলে তাকে হয়তো শাস্তি দিত অর্থাৎ, তুমি আমার নম্রতার অন্যায় সুযোগ নিচ্ছ কিন্তু তিনি (রা.) তাকে পুরস্কৃত করেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, "হযরত আলী (রা.)'র পুত্রদ্বয় হযরত হাসান ও হযরত হোসেইন (রা.)-কে জনৈক ব্যক্তি পড়াত। একবার হযরত আলী (রা.) তাঁর সন্তানদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন শুনতে পান, তাঁর ছেলেদেরকে তাদের শিক্ষক **'খাতেমান নবীঈন'** পড়াচ্ছেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমার সন্তানদের তুমি **'খাতেমান নবীঈন'** পড়াবে না বরং **'খাতামান নবীঈন'** পড়াও অর্থাৎ **'তা'-এর নিচে যের না দিয়ে 'তা'-এর ওপর যবর দিয়ে পড়াও**। অর্থাৎ, যদিও এই উভয় ক্বিরাআত প্রচলিত আছে কিন্তু আমি **'খাতামান নবীঈন'** এর ক্বিরাআত অধিক পছন্দ করি কেননা, **'খাতামান নবীঈন'** এর অর্থ হল, নবীদের মোহর আর **'খাতেমান নবীঈন'** এর অর্থ হল, নবীদের সমাপ্তকারী বা খতমকারী। আমার সন্তানদেরকে **'তা'-এর ওপর যবর** দিয়ে পড়াবে।" **(ফরীযায়ে তবলীগ আওর আহমদী খওয়াতীন, আনওয়ারুল উলূম, ১৮তম খণ্ড, পৃ: ৪০৪)**

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে এটিও প্রমাণিত হয় যে, তিনি পবিত্র কুরআনের হাফেয ছিলেন। এমনকি তিনি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ধারাবাহিকতা অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের অব্যবহতি পরেই কুরআন সংকলনের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন।" **(দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, ২০তম খণ্ড, পৃ: ৪২৯)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অপর এক স্থানে বলেন, "মহানবী (সা.)-কে কোন এক সাহাবী খাবার নিমন্ত্রণ করেন, তাঁর সাথে আরো কয়েকজন সাহাবীও আমন্ত্রিত ছিলেন আর হযরত আলী (রা.)-ও তাঁদের একজন ছিলেন। তুলনামূলকভাবে হযরত আলী (রা.)'র বয়স কম ছিল তাই কতিপয় সাহাবী তাঁর সাথে রসিকতা করেন। তারা একের পর এক খেজুর খেয়ে খেজুরের আঁটি হযরত আলী (রা.)'র সামনে রাখতে থাকেন। মহানবী (সা.)-ও এমনটিই করছিলেন। হযরত আলী (রা.) যুবক ছিলেন, আহারে ব্যস্ত ছিলেন তাই এদিকে লক্ষ্য করেন নি। দৃষ্টি পড়তেই দেখেন তাঁর সামনে খেজুরের আঁটির স্তুপ জমে আছে। সাহাবীরা রসিকতা করে হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, তুমি সব খেজুর খেয়ে ফেলেছ!! এই যে তোমার সামনে সব আঁটি পড়ে আছে। হযরত আলী (রা.)'র স্বভাবেও রসিকতা ছিল, খিটখিটে ছিলেন না। তিনি যদি খিটখিটে স্বভাবের হতেন তাহলে সাহাবীদের সাথে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়তেন আর বলতেন, আপনারা আমাকে অভিযুক্ত করছেন বা আমার সম্বন্ধে কু-ধারণা করছেন। হযরত আলী (রা.) বুঝে ফেলেন যে, তাঁর সাথে রসিকতা করা হয়েছে। হযরত আলী ভাবেন, এখন আমার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমিও রসিকতাচ্ছলেই এর উত্তর দিবো। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, আপনারা তো আঁটিও খেয়ে ফেলেছেন কিন্তু আমি তো আঁটি রেখে দিয়েছি। অর্থাৎ আপনারা তো আঁটিসহ খেজুর খেয়ে ফেলেছেন কিন্তু আমি সব আঁটি রেখে দিয়েছি আর এর প্রমাণ হল, আঁটির স্তুপ আমার সামনে জমে আছে; এভাবে সাহাবীদের রসিকতা উল্টো তাদের বিরুদ্ধেই বর্তেছে।" **(খুতবাতে মাহমুদ, ৩৩তম খণ্ড, পৃ: ২৫৯-২৬০)**

হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, "হাদীসে আছে একবার মহানবী (সা.) (নামাযে) পবিত্র কুরআন পাঠ করছিলেন। (তিলাওয়াতে ভুল হলে) হযরত আলী (রা.) তা স্মরণ করিয়ে দেন। নামাযের পর তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, ভুল স্মরণ করানোর জন্য নির্ধারিত লোক আছে, এটি তোমার কাজ নয়।" **(খুতবাতে মাহমুদ, ২৫তম খণ্ড, পৃঃ ২৯৯)**

{তিনি (সা.)} নামাযে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন, তখন সম্ভবত কোথাও আগে পরে হয়ে গিয়ে থাকবে, তখন হযরত আলী (রা.) তা স্মরণ করিয়ে দেন। এ কারণে মহানবী (সা.) বলেন, এ কাজের জন্য আমি লোক নিযুক্ত করে রেখেছি, তুমি এ কাজ করো না। অথচ হযরত আলী (রা.)-ও যথেষ্ট জ্ঞানী ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অপর এক স্থানে বলেন,

"পবিত্র কুরআনে নির্দেশ রয়েছে, মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে কোন পরামর্শ নিতে হলে প্রথমে সদকা দিবে। তিনি (রা.) বলেন, এই নির্দেশ অবতীর্ণ হবার পূর্বে হযরত আলী (রা.) কখনো মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে কোন পরামর্শ নেন নি কিন্তু এ নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আলী (রা.) তাঁর সকাশে উপস্থিত হয়ে কিছু টাকা সদকা হিসাবে উপস্থাপন করে নিবেদন করেন, আমি কিছু পরামর্শ নিতে চাই। মহানবী (সা.) নিরালায় হযরত আলী (রা.)'র সাথে কথা বলেন। অন্য এক সাহাবী হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কোন বিষয়ে পরামর্শ নিয়েছেন? হযরত আলী (রা.) বলেন, পরামর্শ নেয়ার মত তেমন বিশেষ কিছু ছিল না কিন্তু আমি ভাবলাম পবিত্র কুরআনের উক্ত নির্দেশের ওপরও আমল হওয়া উচিত।" **(খুতবাতে মাহমুদ, ২৫তম খণ্ড, পৃঃ ৭৫২)**

এই ছিল সাহাবীদের রীতি। অপর একস্থানে আরেকটি ঘটনা এভাবেও বর্ণিত হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশ, **'যদি তোমাকে কোন বাড়ির কেউ বলে, তুমি ফিরে যাও; তাহলে ফিরে যাবে–'** (পবিত্র কুরআনের এই আদেশের ওপর আমল করার জন্য) এক সাহাবী মানুষের বাড়ি বাড়ি যেতেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি কয়েকবার চেষ্টা করি বরং অনেক সময় প্রত্যেক দিন কোন না কোন বাড়িতে যেতে চেষ্টা করি, যেন কেউ না কেউ আমাকে ফিরে যেতে বলে আর আমি সানন্দে ফিরে এসে কুরআনের এই শিক্ষার প্রতি আমল করতে পারি। কিন্তু আমার এই বাসনা কখনো পূর্ণ হয়নি। কোন বাড়ির লোকই আমাকে ফিরে যেতে বলেনি। **(তফসীর আল্ জামে' লি-আহকামিল কুরআন লিল্কুরতুবী, ১৫তম খণ্ড, পৃঃ ১৯৯, সূরা নূর এর ২৯ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যা, বৈরুতের মু'আসাসাতুর রিসালাহ্ থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত)**

বর্তমানে আমরা যদি কাউকে বলি, আমরা ব্যস্ত আছি ফিরে যাও বা এখন সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয় তাহলে মানুষ তা পছন্দ করে না। কিন্তু সাহাবীদের তাক্বওয়া বা খোদাভীতির মান হল, তারা কুরআনের প্রতিটি নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করতেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) একবার কোন এক উদ্দেশ্যে সাহাবীদের কাছে চাঁদা চান। হযরত আলী (রা.) বাহিরে গিয়ে ঘাস কাটেন আর সেই ঘাস বিক্রি করে যে মূল্য পান তা চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন।" **(খুতবাতে মাহমুদ, ৩৩তম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭)**

একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) সম্ভবত তার দরসে বলেছিলেন, হযরত আল্লামা উবায়দুল্লাহ্ বিসমিল সাহেব একজন শীর্ষস্থানীয় শিয়া আলেম ছিলেন। তিনি এরূপ পুণ্যবান এবং জ্ঞানের গভীর সমুদ্র ছিলেন যে, তাঁর আহমদীয়াত গ্রহণের পর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকে দেশ বিভাগের পরও বরং আজও তার রচিত কোন কোন গ্রন্থ শিয়া মাদরাসাগুলোতে

পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পড়ানো হচ্ছে। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, আমি যখন ওয়াক্‌ফে জাদীদ (বিভাগে) ছিলাম, আমার মনে আছে একবার এক শিয়া বন্ধু আমার সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে আসেন। আলোচনায় তিনি আশ্বস্ত হন এবং আল্লাহ্‌র কৃপায় আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্তের পর তিনি আমাকে বলেন, আমি পূর্বে আপনাকে বলিনি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, তিনি একজন শিয়া আলেম ছিলেন; তার পদবী আমার মনে নেই, কিন্তু তিনি শেখুপুরার কোন গ্রাম বা ফয়সালাবাদের কোন গ্রাম বা পার্শ্ববর্তী কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বলেন, শিয়াদের মধ্যে আমি একজন আলেমের মর্যাদা রাখি। অর্থাৎ যিনি বয়আত করেছেন, তার সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বর্ণনা করছেন, তিনি একজন শিয়া আলেম ছিলেন। (সেই ব্যক্তি বলছেন,) আমি একজন আলেম এবং শিয়া সম্প্রদায়ে যথেষ্ট সম্মানের অধিকারী। কিন্তু আজ আমি আপনাকে এ কথা বলছি, এখনো আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে উবায়দুল্লাহ্ বিসমিল সাহেবের পুস্তকাবলী পড়ানো হচ্ছে। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, তাঁর জ্ঞানের এরূপ প্রভাব রয়েছে, এখনো বিসমিল সাহেবের পুস্তক পড়াচ্ছে কিন্তু শিয়া লোকেরা আমাদেরকে বলে না যে, তারা তার বই পড়াচ্ছে! যাহোক, তিনি {অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)) বলছেন, এই আলেমের মাধ্যমে আমি তো অবগত হয়েছি। কিন্তু তারা সেখানে পাঠদানকালে এটি বলে না যে, তিনি কে ছিলেন। আর পরবর্তীতে বিসমিল সাহেবের সাথে কী হয়েছিল। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করেন এবং সেসব সম্মান ও মর্যাদাকে পদদলিত করেন যা তিনি সে যুগে শিয়া সম্প্রদায়ে অর্জন করেছিলেন। এটি তার-ই বইয়ের উদ্ধৃতি, কোন সাধারণ মানুষের উদ্ধৃতি নয়; হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তার বইয়ের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। এই ভূমিকা তুলে ধরে আল্ বাযার তার মুসনাদে লিখেন, হযরত আলী (রা.) লোকদের জিজ্ঞেস করেন, **"বল তো! সবচেয়ে বেশি সাহসী কে? (লোকেরা) উত্তর দেয়, আপনি সবচেয়ে বেশি সাহসী। তিনি (রা.) বলেন, আমি তো সর্বদা আমার সমকক্ষের সঙ্গে-ই লড়াই করি। তাহলে আমি সবচেয়ে সাহসী কীভাবে হলাম! পুনরায় হযরত আলী (রা.) জিজ্ঞেস করেন, এখন তোমরা বল, সবচেয়ে বেশি সাহসী কে?** এটি বিসমিল সাহেব একটি বইয়ের উদ্ধৃতি মূলে নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। লোকেরা নিবেদন করে, জনাব! আমরা জানি না, আপনিই বলুন। তখন তিনি (রা.) বলেন, সবচেয়ে নির্ভীক ও সাহসী হলেন, হযরত আবু বকর (রা.)। {হযরত আলী (রা.) বলেন, সবচেয়ে নির্ভীক ও সাহসী হলেন, হযরত আবু বকর (রা.)} **তোমরা শোন! বদরের যুদ্ধে আমরা মহানবী (সা.)-এর জন্য একটি ছাউনি প্রস্তুত করেছিলাম। আমরা পরস্পর** (এই মর্মে) **পরামর্শ করি যে, এই ছাউনির নিচে মহানবী (সা.)-এর সাথে কে থাকবে? পাছে কোথাও যেন এমন না হয় যে, কোন মুশরিক আবার মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করে বসে। খোদার কসম! আমাদের কারো অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই হযরত আবু বকর (রা.) তরবারি হাতে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর পাশে দণ্ডায়মান হন। এরপর কোন মুশরিকের মহানবী (সা.)-এর কাছে আসার সাহস হয় নি। আর কেউ এমন দুঃসাহস দেখালে তিনি (রা.) তৎক্ষণাৎ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এজন্য হযরত আবু বকর (রা.)-ই সবচেয়ে বড় বীর।** একথাগুলো হযরত আলী (রা.) বলেছেন।

হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেন, একবারকার ঘটনা, মুশরিকরা মহানবী (সা.)-কে ঘিরে ফেলে এমনকি তারা তাঁকে টানাহেঁচড়া করছিল আর বলছিল, তুমি-ই সেই ব্যক্তি যে বলে, খোদা এক। হযরত আলী (রা.) বলেন, খোদার কসম! মুশরিকদের মোকাবিলা করার সাহস কারোই হয় নি, কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এগিয়ে যান এবং মুশরিকদের মারতে মারতে এবং ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন, পরিতাপ তোমাদের জন্য! তোমরা এমন একজন মানুষকে কষ্ট দিচ্ছো যিনি বলেন, আমার

প্রভু-প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ্। একথা বলে হযরত আলী (রা.) নিজের পরিধেয় চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে এত কাঁদেন যে, তাঁর শ্মশ্রু ভিজে যায় আর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের হিদায়াত দান করুন। হে লোকেরা! তোমরাই বল, আলে ফেরাউনের মু'মিনরা উত্তম ছিল নাকি আবু বকর (রা.) উত্তম? আলে ফেরাউনের পক্ষ থেকে যারা ঈমান এনেছিল তারা তাদের নবীর জন্য ততটা আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নি যতটা নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। লোকেরা একথা শুনে নীরব থাকে তখন হযরত আলী (রা.) বলেন, হে লোকেরা! উত্তর দিচ্ছ না কেন? খোদার কসম! আবু বকর (রা.)'র এক মুহূর্ত আলে ফেরাউনের মু'মিনদের হাজার মুহূর্তের চেয়ে বা তার চেয়েও অধিক উত্তম। এর কারণ হল, তারা তাদের ঈমান গোপন রাখতো কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর ঈমান আনার ঘোষণা প্রকাশ্যে দিয়েছেন। {দরসুল কুরআন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.), ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪}

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, **"হে আলী! তোমার তবলীগে যদি একজনও ঈমান আনে তাহলে তা তোমার জন্য এর চেয়ে উত্তম যে, দুই পাহাড়ের মাঝে তোমার ছাগল ও ভেড়ার অনেক বড় একটি পাল অতিক্রম করবে আর তুমি তা দেখে আনন্দিত হবে।"** (হামারে যিম্মাহ তামাম দুনিয়া কো ফাতাহ্ করনে কা কাম হ্যায়, আনওয়ারুল উলূম, ১৮তম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৪)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মহানবী (সা.)-কে আমি বলতে শুনেছি, **"যে আলী (রা.)-কে ভালোবাসে সে আমাকে ভালোবাসে এবং যে আমাকে ভালোবাসে সে আল্লাহ্কে ভালোবাসে আর যে আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং যে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে আল্লাহ্র প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।"** (মজমাউয্ যওয়ায়েদ, ৯ম খন্ড, পৃঃ ১২৬, কিতাবুল মানাকেব, মানাকেবু আলী বিন আবী তালিব (রা.), হাদীস নংঃ ১৪৭৫৭, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)

হযরত যার বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, **"সেই সত্তার কসম! যিনি শষ্যবীজকে বিভক্ত করেছেন এবং আত্মা সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চিতরূপে আমার সাথে নিরক্ষর নবী (সা.)-এর এই প্রতিশ্রুতি ছিল যে, কেবল মু'মিনই আমার প্রতি ভালোবাসা রাখবে আর শুধুমাত্র মুনাফিকই আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে।"** (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব আদ্ দলীলু আলা আন হুব্বাল আনসার মিনাল ঈমান...,হাদীস নংঃ ২৪০)

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাকে ডেকে নিয়ে বলেন, **"তোমার দৃষ্টান্ত হল হযরত ঈসা'র ন্যায়, যার প্রতি ইহুদীরা এত বেশি বিদ্বেষ পোষণ করে যে, তাঁর মাতার প্রতি (তারা) অপবাদ আরোপ করে আর খ্রিষ্টানরা তাঁর অর্থাৎ ঈসা (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসায় এতটা বাড়াবাড়ি করে যে, তারা তাঁকে সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে যে মর্যাদা তাঁর ছিল না।"** এরপর হযরত আলী (রা.) বলেন, **সাবধান! আমার বিষয়ে দুই ধরণের মানুষ ধ্বংস হবে। প্রথমত সেসব লোক (ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে) যারা আমাকে মাত্রাতিরিক্ত ভালোবেসে সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবে যে মর্যাদা আমার নয় আর দ্বিতীয়ত তারা (ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে) যারা আমার প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণের দরুণ আমার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করবে।** (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৯, মুসনাদ আলী বিন আবী তালিব (রা.), হাদীস নংঃ ১৩৭৭, বৈরুতের আলিমুল্ কুতুব থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত)

হযরত আলী (রা.) ফ্যায়-এর সম্পদ অর্থাৎ সেই মালে গণিমত বা সম্পদ যা শত্রুর সাথে যুদ্ধ না করেই হস্তগত হয় তা বন্টনের ক্ষেত্রে হযরত আবু বকর (রা.)'র পন্থা অনুসরণ করতেন। তাঁর (রা.)'র নিকট যে সম্পদই আসত তিনি (রা.) তার পুরোটাই বিতরণ করে দিতেন আর তা থেকে কিছুই সঞ্চিত রাখতেন না, কেবল তা ব্যতীত যা উক্ত দিন বিতরণের পর রয়ে যেত। তিনি (রা.) বলতেন, হে পৃথিবী! যাও আর

আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ধোঁকা দাও। তিনি (রা.) নিজেও ফ্যায়-এর সম্পদ থেকে কিছু নিতেন না আর কোন ঘনিষ্ট বন্ধু বা আত্মীয়কেও কিছু দিতেন না। তিনি (রা.) গভর্নরের পদ বা অন্যান্য পদ কেবল সৎ ও বিশ্বস্ত লোকদেরকেই দিতেন আর তাদের কারো পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পেলে তিনি (রা.) তাকে এই আয়াতটি লিখে প্রেরণ করতেন, قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ (সূরা ইউনুস: ৫৮) অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য উপদেশবাণী এসে গেছে এবং أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (সূরা হুদ: ৮৬-৮৭) অর্থাৎ, তোমরা ন্যায্যভাবে পূর্ণ মাপ ও ওজন দিও, মানুষকে তাদের প্রাপ্য দ্রব্যসামগ্রী কম দিও না আর নৈরাজ্যবাদীর ন্যায় তোমরা দেশে অশান্তি ছড়িও না। তোমরা প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাকলে (নিশ্চিত জানবে) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (ব্যবসায়) যা অবশিষ্ট থাকে তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম। আর আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই। একই সাথে তিনি (রা.) তাকে লিখতেন, আমার এ পত্র তোমার কাছে পৌঁছার পর তোমার নিকট আমাদের যে সম্পদ (গচ্ছিত) রয়েছে তা সযত্নে রেখে দিবে, যতক্ষণ না আমরা তোমার নিকট এমন কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করি যে তোমার কাছ থেকে তা বুঝে নেবে।

এরপর তিনি (রা.) আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতেন, **হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই তুমি জান, আমি তাদেরকে তোমার সৃষ্টির প্রতি অত্যাচার করার এবং তোমার প্রাপ্য পরিত্যাগের আদেশ দেই নি।**

আবজার বিন জুরমুয নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, আমি হযরত আলী বিন আবী তালিব (রা.)-কে দেখেছি, তিনি কূফা থেকে বের হচ্ছিলেন এবং তাঁর গায়ে দু'টি কিতরী চাদর ছিল। (কিতর বাহরাইনের একটি গ্রামের নাম যেখানে লাল ডোরাকাটা চাদর বোনা হত।) যার একটিকে তিনি লুঙ্গির মত পরে রেখেছিলেন এবং অন্যটিকে (দেহের) উর্ধ্বাংশে জড়িয়ে রেখেছিলেন। তার লুঙ্গি গোছার মাঝামাঝি পর্যন্ত ছিল। তিনি (রা.) একটি চাবুক হাতে নিয়ে বাজারে হাঁটছিলেন এবং লোকদেরকে আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন করতে, সত্য কথা বলতে, উত্তমরূপে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং পরিমাপ ও ওজন পূর্ণরূপে প্রদানের উপদেশ দিচ্ছিলেন।

মুজাম্মে' তাইমী কর্তৃক বর্ণিত, একবার হযরত আলী (রা.) বায়তুল মালে যে পরিমাণ সম্পদ ছিল তার সবটুকু মুসলমানদের মাঝে বিতরণ করে দেন। এরপর তাঁর নির্দেশে তাতে চুনকাম করানো হয়েছে। অতঃপর তিনি (রা.) সেখানে এ প্রত্যাশা নিয়ে নামায পড়েন যেন কিয়ামতের দিন এটি তাঁর পক্ষে সাক্ষী দেয়। {**আল্ ইসতিয়াব ফী মা'রেফাতিস সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১১১-১১১৩, যিকরু আলী বিন আবী তালিব (রা.), বৈরুতের দারুল্ জীল থেকে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত**}, (**লুগাতুল হাদীস, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৭৫, লাহোরের নু'মানী খুতুবখানা থেকে ২০০৫ সালে প্রকাশিত**)

হযরত আলী (রা.)'র স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে বলেন, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ৭ ডিসেম্বর, ১৮৯২ সনে তাঁর একটি রুইয়্যা বা সত্যস্বপ্ন বর্ণনা করেন, আমি যা দেখি তা হল, আমি হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু হয়ে গিয়েছি! অর্থাৎ স্বপ্নে আমি মনে করি আমিই তিনি। স্বপ্নের বিস্ময়কর বিষয়গুলোর মাঝে একটি হল, কখনো কখনো এক ব্যক্তি নিজেকে অন্য মানুষ মনে করে। তাই তখন আমি মনে করেছিলাম, আমি আলী মুরতযা। আর এমন পরিস্থিতি বিরাজমান যে, খারেজীদের একটি গোত্র আমার খিলাফতের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে; অর্থাৎ সেই গোষ্ঠী আমার খিলাফতের কার্যক্রম ব্যাহত করতে চাচ্ছে এবং এতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। এমন সময়ে আমি দেখি, মহানবী (সা.) আমার পাশে রয়েছেন এবং স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে আমাকে বলছেন, يَا عَلِيُّ! دَعْهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ অর্থাৎ হে আলী! তাদের, তাদের সহযোগীদের এবং তাদের ফসল এড়িয়ে চল আর তাদেরকে পরিত্যাগ কর এবং

তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। আমি বুঝলাম, এ নৈরাজ্যের যুগে মহানবী (সা.) আমাকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিচ্ছেন এবং উপেক্ষা করার জোরালো উপদেশ দিচ্ছেন আর বলছেন, তুমিই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু এদের কিছু না বলাই উত্তম। **(বারকাতে খিলাফত, আনওয়ারুল উলূম, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৭৬)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "হযরত আলী (রা.) খারেজী সৈন্যবাহিনীর সবকিছুর ওপর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধের বাহনগুলো লোকদের মাঝে বিতরণ করিয়ে দেন কিন্তু জিনিসপত্র এবং দাস-দাসীদেরকে কূফায় ফিরে আসার পর তাদের মালিকদের ফিরিয়ে দেন।" **(মসলাহ্ ওহীয়ে নবুয়্যত কে মুতায়াল্লেক ইসলামী নযরিয়্যাহ্, আনওয়ারুল উলূম, ২৩তম খণ্ড, পৃ: ৩৬৩)**

অপর এক বরাতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন,

"হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগের তুলনায় হযরত উমর (রা.)'র যুগ মহানবী (সা.)-এর চেয়ে অধিক দূরত্বে ছিল। একই অবস্থা ছিল হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.)'র (ক্ষেত্রেও)। নিঃসন্দেহে তাঁদের আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা তাঁদের পূর্বের খলীফাদের চেয়ে কম ছিল, কিন্তু তাঁদের যুগে যেসব ঘটনা ঘটেছিল তাতে তাঁদের পদমর্যাদার ততটা প্রভাব ছিল না যতটা মহানবী (সা.)-এর যুগ থেকে দূরত্বের প্রভাব ছিল। কেননা হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)'র যুগে অধিকাংশ মানুষ তারা ছিলেন, যারা মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে অন্যদের হস্তক্ষেপ বেড়ে যায়। কাজেই কেউ যখন হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করে, হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)'র যুগে এত বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য হতো না যেমনটি আপনার যুগে হচ্ছে। তখন তিনি এর উত্তরে বলেন, আসল কথা হল– আবু বকর (রা.) ও উমরের (রা.)'র অধীনে আমার মতো লোকেরা ছিল আর আমার অধীনে রয়েছে তোমার মতো মানুষ।" **(জামাতে আহমদীয়া আওর হামারী যিম্মাদারীয়াঁ, আনওয়ারুল উলূম, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৫)**

এরপর আরেক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সেই যুগে যখন হযরত আলী (রা.) এবং মুয়াবিয়ার মাঝে যুদ্ধ চলছিল তখন এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)'র নিকট এসে বলে, আপনি হযরত আলী (রা.)'র যুগের যুদ্ধসমূহে যোগ দেন না কেন। অথচ পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ (সূরা আল্ বাকারা: ১৯৪)। উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, আমরা এ নির্দেশ মহানবী (সা.)-এর যুগেই পালন করেছি যখন মুসলমানদের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল এবং মানুষকে তার ধর্মের জন্য পরীক্ষায় নিপতিত করা হতো। অর্থাৎ হয় তাকে হত্যা করা হতো নতুবা শাস্তি দেয়া হতো। এমতাবস্থায় ইসলাম সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে, এরপর আর কাউকে পরীক্ষায় নিপতিত করা হতো না।" **(তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২৭-৪২৮)**

অর্থাৎ যুদ্ধ হলে তা হতো ধর্ম পরিবর্তনের জন্য বা তাদের বিরুদ্ধে ছিল যারা ধর্ম পরিবর্তন করতে চাইত। এখানে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এখন কোন বিরোধ নেই; (শুধু) কোন কোন দৃষ্টিভঙ্গিগত মতবিরোধ রয়েছে, এজন্য আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি না। যাহোক এটি তার নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, **"রোমান সম্রাট হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)'র (মধ্যকার) যুদ্ধের সংবাদ জানার পর ইসালামী রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ করতে চাইলে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাকে লিখেন, সাবধান! আমাদের পারস্পরিক মতবিরোধ দেখে ভুল করো না। তুমি যদি আক্রমণ কর তাহলে মনে রেখো, হযরত আলী (রা.)'র পক্ষে সর্বপ্রথম যে সেনাপতি তোমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবে– সে হব আমি।"** **(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৩০)**

তিনি (রা.) এর বিশদ বিবরণ কিছুটা এভাবেও বর্ণনা করেছেন যে, এমন একটি যুগ ছিল যখন রোমান সম্রাট হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)'র মাঝে মতবিরোধ দেখে তখন সে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার জন্য একটি সেনাবাহিনী প্রেরণের ফন্দি আঁটে। সেই যুগে রোমান সাম্রাজ্য তেমনই পরাশক্তি ছিল যেমনটি আজকের আমেরিকা। তার সেনা অভিযানের অভিপ্রায় দেখে অত্যন্ত বিচক্ষণ এক যাজক বলে, হে বাদশাহ্! আপনি আমার কথা শুনুন আর সেনা অভিযান পরিচালনা থেকে বিরত থাকুন। পরস্পর মতভেদ রাখলেও তারা আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে এবং পারস্পরিক অনৈক্য ভুলে যাবে। এরপর সে একটি উদাহরণ দেয় আর তা-ও সে কোন্ অভিপ্রায়ে দিয়েছে, তুচ্ছতাচ্ছিল্যের স্বরে নাকি এমনিতেই ধরে নিয়েছে যে, এটি উত্তম উদাহরণ হবে (তা জানা নেই)। সে বলে, আপনি কয়েকটি কুকুর আনিয়ে নিন এবং তাদের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ক্ষুধার্ত রাখুন। এরপর তাদের সামনে মাংস ছুড়ে দিলে তারা পরস্পর লড়াই আরম্ভ করবে। (কিন্তু) আপনি যদি সেই কুকুরগুলোর সামনেই বাঘ ছেড়ে দেন তাহলে তারা নিজেদের মতভেদ ভুলে গিয়ে বাঘের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই উদাহরণের মাধ্যমে সে যা বুঝিয়েছে তা হল, তুমি এখন হযরত আলী (রা.) ও মুআবিয়া (রা.)'র মধ্যকার মতবিরোধের সুযোগ নিতে চাইছ, কিন্তু আমি এটি বলে দিচ্ছি, যখনই কোন বহিঃশত্রুর সাথে লড়াইয়ের পরিস্থিতি দেখা দিবে, তারা উভয়ে নিজেদের পারস্পরিক মতবিরোধ ভুলে গিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। আর হয়েছেও তা-ই। হযরত মুআবিয়া (রা.) রোমান সম্রাটের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অবগত হয়ে তাকে এই বার্তা প্রেরণ করেন যে, তুমি আমাদের মতবিরোধের সুযোগ নিয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছ, কিন্তু আমি তোমাকে বলে দিতে চাই, আমার সাথে যদিও হযরত আলী (রা.)'র মতবিরোধ রয়েছে কিন্তুতোমার সেনাবাহিনী যদি আক্রমণ করে তাহলে সেই সেনাদলের মোকাবিলার জন্য হযরত আলী (রা.)'র পক্ষে সর্বপ্রথম যে জেনারেল দণ্ডায়মান হবে– আমি হব সেই ব্যক্তি। **(১৯৫৬ সালে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমায় প্রদত্ত খিতাবাত, আনওয়ারুল উলূম, ২৫তম খণ্ড, পৃঃ ৪১৬-৪১৭)**

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)'র কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.) বলতেন, **আমাদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম কুরআন পাঠকারী হলেন উবাই বিন কা'ব (রা.) আর আমাদের মাঝে উত্তম সিদ্ধান্ত প্রদানকারী হলেন আলী (রা.)**। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর সূরা আল্ বাকারাহ্, বাব ক্বওলুহু মা নানসাখ মিন আয়াতিন আও নুনসিহা না'তি বিখাইরিম্ মিনহা আও মিসলিহা, হাদীস নংঃ ৪৪৮১)**

হযরত উম্মে আতীয়্যাহ্ বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একটি সেনাদল প্রেরণ করেন যাতে হযরত আলী (রা.)ও ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহ্র রসূল (সা.)-কে এই দোয়া করতে শুনেছি, **"হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে আলী (রা.)'র চেহারা না দেখানো পর্যন্ত মৃত্যু দিও না"**। **{উসদুল গাবাহ্ লি-মা'রেফাতিস সাহাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০০, যিকরু আলী বিন আবী তালিব (রা.), বৈরুতের দারুল ফিক্র থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

মহানবী (সা.) একদা হযরত আলী (রা.)-কে একটি সেনা অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন মহানবী (সা.) তাকে বলেন, **আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং জিবরাঈল তোমার প্রতি সন্তুষ্ট**। **(কনযুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃঃ ১০৮, হাদীস নংঃ ৩৬৩৪৯, বৈরুতের মু'আসাসাতুর রিসালাহ্ থেকে ১৯৮১ সালে প্রকাশিত)**

এক স্থানে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, "আমীর মুআবিয়া (রা.) যিরার সুদাঈ-কে বলেন, আমার সামনে হযরত আলী (রা.)'র বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা কর। সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাকে ক্ষমা করবেন। আমীর মুআবিয়া বলেন, তোমাকে বলতেই হবে। যিরার বলে, যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে শুনুন, খোদার কসম! হযরত আলী (রা.) বড়মনা এবং দৃঢ় শক্তিবৃত্তির অধিকারী ছিলেন। সুনিশ্চিৎ কথা বলতেন এবং

ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রবহমান ঝরণাধারা ছিলেন আর তাঁর প্রতিটি কথা প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি ইহজগৎ এবং এর চাকচিক্যকে ভয় করতেন আর রাত ও এর নির্জনতাকে ভালোবাসতেন। তিনি অনেক ক্রন্দনকারী এবং অনেক প্রণিধানকারী মানুষ ছিলেন। তিনি সাধারণ পোশাক এবং একান্ত সাদামাটা খাবার পছন্দ করতেন। তিনি আমাদের মাঝে আমাদের মতোই এক সাধারণ মানুষের মতো অবস্থান করতেন। আমরা প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিতেন আর কোন ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে সম্পর্কে অবহিত করতেন। খোদার কসম! তাঁর সাথে আমাদের এবং আমাদের সাথে তাঁর ভালোবাসা ও নৈকট্যের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁর প্রতাপের কারণে তাঁর সাথে কম কথা বলতাম। তিনি ধার্মিক লোকদের সম্মান করতেন এবং মিসকীনদের নিজ সান্নিধ্যে আশ্রয় দিতেন। কোন শক্তিশালী ব্যক্তি এই আশা করত না যে, সে নিজের কোন মিথ্যা কথা তাঁর কাছে গ্রহণীয় করতে পারবে আর কোন দুর্বল ব্যক্তি তাঁর ন্যায়বিচারের প্রতি আশাহত হতো না। খোদার কসম! কোন কোন ক্ষেত্রে আমি দেখেছি, রাত নেমে এলে এবং তারকারাজি নিস্প্রভ হয়ে গেলে তিনি তাঁর দাড়ি ধরে এমনভাবে ছটফট করতেন যেভাবে সাপের দংশনে দংশিত ব্যক্তি ছটফট করে আর ভীষণ দুঃখ ভারাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় কাঁদতেন এবং বলতেন, হে জগৎ! যা, তুই আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রতারিত করার চেষ্টা কর। তুই কি আমার সাথে বিতর্ক করছিস আর নিজেকে আমার সামনে সেজেগুজে প্রদর্শন করছিস? তুই যা চাস তা কখনো হবে না, কখনো হবে না। আমি তো তোকে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছি, যার পর প্রত্যাবর্তনের কোন সুযোগ নেই, কেননা তোর জীবনকাল স্বল্প এবং তোর কোন ভরসা নেই। (এখানে তিনি রূপক ভাষায় পৃথিবীকে সম্বোধন করেছেন, তোর জীবনকাল স্বল্প আর তুই অর্থহীন।) হায়! পাথেয় কম এবং সফর দীর্ঘ আর পথ ভীতিপ্রদ। তিনি যখন তাঁর (অর্থাৎ হযরত আলীর) গুণাবলী সম্পর্কে এসব কথা বলেন তখন এগুলো শুনে আমীর মুয়াবিয়া কেঁদে উঠেন এবং বলেন, **আল্লাহ্ তা'লা আবুল হাসানের প্রতি কৃপা করুন। খোদার কসম! তিনি এমনই ছিলেন। হে যিরার! আলী (রা.)'র মৃত্যুতে তুমি কেমন কষ্ট পেয়েছ? যিরার বলেন, সেই নারীর মতো কষ্ট পেয়েছি যার সন্তানকে তার কোলেই জবাই করে দেয়া হয়।** {আল্ ইসতিয়া'ব ফী মা'রেফাতিল্ আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১০৭-১১০৮, যিকরু আলী বিন আবী তালিব (রা.), বৈরুতের দারুল্ জীল থেকে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত)

হযরত আলী (রা.)'র বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহ অনেক প্রসিদ্ধ, তার মধ্য থেকে কয়েকটি উল্লেখ করছি যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করছেন। তিনি (রা.) বর্ণনা করেন,

"হযরত আলী (রা.)'র যুগের একটি ঘটনা, যা তাবরী লিখেছেন, (তিনি) বলছেন, ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই এই সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে। সেই ঘটনাটি হল, আদল বিন উসমান বর্ণনা করেন, (আরবী যে উদ্ধৃতি রয়েছে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সেটিও পুরো লিখেছেন, আমি এখন সেই আরবী উদ্ধৃতি ছেড়ে দিচ্ছি, খুতবা যখন ছাপা হবে তখন ইনশাআল্লাহ্ তা লিখে দেয়া হবে।) رَاَيْتُ عَلِيًّا عَمَّ خَارِجًا مِنَ هَمَدَانَ فَرَاَى فِتْيَتَيْنِ تَقْتَلَانِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ مَضٰى فَسَمِعَ صَوْتًا يَاغَوْثًا بِاللّٰهِ فَخَرَجَ يَحُضُّ نَحْوَهٗ حَتّٰى سَمِعْتُ خَفْقَ نَعْلِهٖ وَهُوَ يَقُوْلُ اَتَاكَ الْغَوْثُ فَاِذَا رَجُلٌ يُلَازِمُ رَجُلًا فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِعْتُ مِنْ هٰذَا ثَوْبًا بِتِسْعَةِ دَرَاهِمَ وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ اَنْ لَّا يُعْطِيَنِيْ مَغْمُوْرًا وَلَا مَقْطُوْعًا وَكَانَ شَرْطُهُمْ يَوْمَئِذٍ فَاَتَيْتُهٗ بِهٰذِهِ الدَّرَاهِمِ لِيُبَدِّلَهَا لِيْ فَاَبٰى فَلَزِمْتُهٗ فَلَطَمَنِيْ فَقَالَ اَبْدِلْهُ فَقَالَ بَيِّنَتُكَ عَلَى اللَّطْمَةِ فَاَتَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَاَقْعَدَهٗ ثُمَّ قَالَ دُوْنَكَ فَاقْتَصَّ فَقَالَ اِنِّيْ قَدْ

عَفَوْتُ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ اِنَّمَا اَرَدْتُ اَنْ اَحْتَاطَهُ فِيْ حَقِّكَ ثُمَّ ضَرَبَ الرَّجُلَ تِسْعَ دُرَّاتٍ وَقَالَ هٰذَا حَقُّ السُّلْطَانِ। । এর অনুবাদ হল, "আমি দেখেছি, হযরত আলী (রা.) হামাদানের বাহিরে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি দু'টি দলকে পরস্পর বিবদমান দেখতে পান এবং তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেন। কিন্তু কিছুদূর যেতেই এক ব্যক্তির আওয়াজ তাঁর কাছে পৌঁছে যে, খোদার খাতিরে কেউ আমাকে সাহায্য করুন। অতএব তিনি দ্রুত সেই আওয়াজের উৎসের দিকে ছুটে যান, এমনকি তার জুতার আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল আর তিনি বলছিলেন, সাহায্য এসে গেছে, সাহায্য এসে গেছে। তিনি (রা.) যখন সেই জায়গার কাছাকাছি পৌঁছেন তখন তিনি দেখেন, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে ধস্তাধস্তি করছে। সে তাঁকে (অর্থাৎ হযরত আলীকে) দেখে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি এই লোকের কাছে নয় দিরহামে একটি কাপড় বিক্রি করেছিলাম আর শর্ত ছিল, কোন টাকা অর্থাৎ দিরহাম ত্রুটিপূর্ণ বা ফাঁটাছেড়া থাকবে না আর সে (অর্থাৎ ক্রেতা) তা মেনে নিয়েছিল। (কিন্তু সে আমাকে যে অর্থ দেয় বা দিরহাম দেয় সেগুলোর কয়েকটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল।) অথচ আজ আমি যখন তাকে তার ত্রুটিপূর্ণ টাকাগুলো ফেরত দিতে আসি তখন সে তা বদলে দিতে অস্বীকার করে। তখন আমি তাকে জোরাজুরি করলে সে আমাকে থাপ্পড় মারে। তিনি (রা.) ক্রেতাকে বলেন, তার টাকা বদলে দাও। (অর্থাৎ যে ক্রয় করেছিল তাকে বলেন, তার টাকা বা অর্থ বদলে দাও।) এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলেন, তোমাকে থাপ্পড় মারার প্রমাণ উপস্থাপন কর। সে যখন প্রমাণ উপস্থাপন করে তখন তিনি (রা.) আঘাতকারীকে বসিয়ে দেন এবং তাকে (অর্থাৎ আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে) বলেন, তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ কর। সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তিনি (রা.) বলেন, তুমি তো তাকে ক্ষমা করে দিয়েছ, কিন্তু আমি তোমার অধিকারের বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে চাই। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখছেন, মনে হয় সেই ব্যক্তি অত্যন্ত সহজসরল ছিল আর নিজের লাভ-ক্ষতি বুঝতো না। এরপর যে থাপ্পড় মেরেছিল তাকে তিনি (রা.) নয়বার চাবুক মারেন এবং বলেন, এই ব্যক্তি তো তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছিল, কিন্তু তোমার এই শাস্তি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে।" **(তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৬২-৩৬৩)**

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করেন যে, "হযরত আলী (রা.)'র জীবনাদর্শে আরো একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একদা তিনি (রা.) দেখেন, এক ব্যক্তি আরেক জনকে প্রহার করেছে। হযরত আলী (রা.) তাকে থামান এবং আঘাতপ্রাপ্তকে বলেন, এখন তুমি তাকে প্রহার কর। কিন্তু আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি। হযরত আলী (রা.) বুঝতে পারেন, ভয়ের কারণে সে তাকে প্রহার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, কেননা প্রহারকারী ব্যক্তি চরম স্বৈরাচারী ছিল। তাই তিনি (রা.) বলেন, তুমি তোমার নিজ অধিকার ক্ষমা করে দিয়েছ, কিন্তু আমি এখন রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রয়োগ করছি। এরপর তিনি (রা.) তাকে ততোটাই প্রহার করান যতোটা সে অপর দুর্বল ব্যক্তিকে প্রহার করেছিল।" **(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৩১)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, **"হযরত আলী (রা.)'র (আরেকটি) ঘটনা হল, তাঁর একটি মামলা একজন মুসলিম ম্যাজিস্ট্রেট-এর সমীপে উপস্থাপিত হলে সেই ম্যাজিস্ট্রেট হযরত আলী (রা.)'র প্রতি কিছুটা নমনীয় হন। তিনি (রা.) বলেন, আমার প্রতি নমনীয় হয়ে তুমি প্রথম অবিচার করেছ। এই মুহূর্তে আমি এবং সে (অর্থাৎ আমার প্রতিপক্ষ) সমান।"** **(খুতবাতে মাহমুদ, ১৬তম খণ্ড, পৃ: ৫১৬)**

হযরত আলী (রা.)'র মর্যাদাসমূহ্ বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"তিনি কি জাতির সবচেয়ে বাগ্মী বক্তা এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না যারা শব্দাবলীর মাঝে প্রাণ ফুঁকে দেয়? স্বীয় বাগ্মিতা ও বাচনভঙ্গির বলে এবং শ্রোতাদের মাঝে নিজের গভীর প্রভাব দ্বারা মানুষকে

নিজের আশেপাশে সমবেত করা তাঁর জন্য কেবল এক ঘন্টা বরং তদপেক্ষা কম সময়ের কাজ ছিল।" (সির্‌রুল খিলাফা, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫০, সির্‌রুল খিলাফার উর্দূ অনুবাদ, পৃঃ ৮৯-৯০, নাযারাতে এশায়াত, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়া, পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত)

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"আমি শুধু এটি জানি যে, কোন ব্যক্তি মু'মিন ও মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ (তার মাঝে) আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রিযওয়ানুল্লাহি আলায়হিম-এর ন্যায় বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না হয়। তাঁরা (ইহ) জগতকে ভালোবাসতেন না, বরং তারা নিজেদের জীবন খোদার পথে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন।" (লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ২৯৪)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, **"খারেজীরা হযরত আলী (রা.)-কে ফাসেক তথা দুষ্কৃতিপরায়ণ আখ্যায়িত করে এবং তাক্বওয়া বহির্ভূত অনেক কাজ তাঁর প্রতি আরোপ করে, বরং তাঁকে ঈমানের অলংকার থেকেও বঞ্চিত মনে করে** (অর্থাৎ মনে করে তাঁর মাঝে ঈমানই ছিল না বরং তিনি ঈমানের অলংকার বিবর্জিত ছিলেন।) **এখানে স্বভাবতই এ প্রশ্ন জাগে, সিদ্দীক হওয়ার জন্য যখন তাক্বওয়া ও আমানত এবং দিয়ানত হল শর্ত তখন এসব বুযূর্গ ও উন্নত মানের মানুষ, যারা রসূল, নবী এবং ওলী ছিলেন তাঁদের অবস্থাকে খোদা তা'লা কেন সাধারণ লোকদের দৃষ্টিতে সন্দেহযুক্ত করে দিলেন?** (অর্থাৎ কেন তারা সঠিকভাবে বুঝতে পারলেন না? কেন তাঁদের পুরো জীবন ও আদর্শ সংশয়পূর্ণ ছিল?) **এবং তারা তাঁদের কর্ম ও কথা বুঝতে এতটাই অপারগ ছিল যে, তাঁদেরকে তাক্বওয়া, আমানত এবং দিয়ানতের গণ্ডি বহির্ভূত মনে করেছে আর ভেবে নিয়েছে, তাঁরা যেন অত্যাচারী, হারাম ভক্ষণকারী এবং অন্যায়ভাবে হত্যাকারী আর মিথ্যাবাদী, অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ও রিপুর পূজারি এবং অপরাধী ছিলেন। অথচ পৃথিবীতে বহু এমন লোকও রয়েছে যারা রসূল হবার দাবিও করে না আর নবী হবার দাবিও করে না আর নিজেদেরকে ওলী, ইমাম বা মুসলমানদের খলীফা হিসেবেও আখ্যায়িত করে না, অথচ তাদের চালচলন ও জীবনযাপন সম্পর্কে কোন আপত্তি করা হয় না। এ প্রশ্নের উত্তর হল, খোদা তা'লার এমনটি করার কারণ, নিজের বিশেষ গৃহীত ও প্রিয়দেরকে দুর্ভাগা ত্বরাপরায়ণদের থেকে গোপন রাখতে চেয়েছেন, যাদের স্বভাব কেবল কুধারণা করা, যেভাবে তাঁর নিজ সত্তা এরূপ কুধারণাকারীদের কাছে গোপন।"** (তিরইয়াকুল কুলূব, রূহানী খাযায়েন, ১৫তম খণ্ড, পৃঃ ৪২২ এর টীকা)

অর্থাৎ যারা এমন কথা বলে তারা নিজেরাই দুর্ভাগা এবং কুধারণা পোষণকারী। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে নিজেকে গোপন রেখেছেন এবং মানুষ আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কেও কুধারণা করে, অনুরূপভাবে যারা তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত তাদের প্রতিও এসব দুর্ভাগা এবং আপত্তির ক্ষেত্রে ত্বরাপরায়ণ ব্যক্তিরা (কুধারণা করে)। এছাড়া এরাই প্রকৃতপক্ষে সেসব লোক যাদের মাঝে তাক্বওয়া নেই আর তারা মুত্তাকীদের ওপর অপবাদ আরোপ করে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, হযরত আলী (রা.) সত্যান্বেষীদের ভরসাস্থল এবং উদারমনাদের অতুলনীয় আদর্শ এবং (খোদার) বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিদর্শন ছিলেন। এছাড়া স্বীয় যুগের লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম মানব এবং রাষ্ট্রসমূহের (ভাবমূর্তি) উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নূর ছিলেন। কিন্তু তাঁর খিলাফতকাল শান্তি ও নিরাপত্তার যুগ ছিল না, বরং নৈরাজ্য ও অন্যায় এবং সীমালঙ্ঘনের ঝঞ্ঝাবায়ুর যুগ ছিল। জনসাধারণ তাঁর এবং আবু সুফিয়ানের পুত্রের খিলাফত নিয়ে বিতণ্ডায় লিপ্ত ছিল। তারা হতভম্বের ন্যায় এক বুক আশা নিয়ে তাঁদের উভয়ের পানে চেয়ে ছিল। অনেকেই তাঁদেরকে আকাশের **ফরকদ** নামী দু'টো নক্ষত্র মনে করত এবং উভয়কে সমমর্যাদা সম্পন্ন জ্ঞান করত। কিন্তু সত্যি কথা হল, সত্য (আলী)

মুর্তজা (রা.)'র পক্ষে ছিল। যে তাঁর যুগে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, সে বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন করেছে। তবে তাঁর খিলাফত সেই শান্তি ও নিরাপত্তার প্রমাণ বহন করত না যার শুভসংবাদ রহমান খোদার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল। বরং (হযরত আলী) মুর্তজা (রা.)-কে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং তাঁর খিলাফতকাল বিভিন্ন প্রকার ও ধরণের নৈরাজ্য এবং অশান্তিতে নিমজ্জিত ছিল। তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার মহান অনুগ্রহ ছিল, কিন্তু তিনি দুঃখভারাক্রান্ত ও বেদনাপূর্ণ জীবন কাটিয়েছেন। পূর্বের খলীফাদের মতো তিনি ধর্মপ্রচার ও শয়তানকে দমনে ততটা সাফল্য লাভ করেন নি, বরং তিনি স্বয়ং জাতির তীর্যক আক্রমণ থেকে নিস্তার পান নি। তাঁকে (তাঁর) সব উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। তারা তাঁকে সাহায্য করতে নয় বরং তাঁর ওপর অত্যাচার ও নিষ্পেষণের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তারা কষ্ট দেয়া থেকে বিরত হয় নি বরং তাঁর কাজে বাঁধ সেধেছে আর (তাঁর) প্রতিটি পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে, অথচ তিনি মূর্তিমান ধৈর্য ও পরম পুণ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু এটি সম্ভব নয় যে, আমরা তাঁর খিলাফতকে সেই (আয়াতে ইস্তেখলাফে বর্ণিত) শুভসংবাদের সত্যায়নকারী আখ্যা দেই, কেননা তাঁর খিলাফতকাল ছিল অশান্ত, বিদ্রোহপূর্ণ ও অনিষ্টকর যুগ।" **(সির্‌রুল খিলাফা, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫২-৩৫৩, সির্‌রুল খিলাফার উর্দূ অনুবাদ, পৃঃ ৯৫-৯৬, নাযারাতে এশায়াত, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়া, পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত)**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"এই বিশ্বাস লালন করা আবশ্যক যে, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) এবং হযরত উমর ফারুক (রা.) ও হযরত যুন্নুরাইন (রা.) আর হযরত আলী মুর্তজা (রা.) তাঁরা সবাই সুনিশ্চিতভাবে ধর্মের বিষয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন।"** **(মকতুবাতে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫১, পত্র নংঃ ২, হযরত খান সাহেব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের নামে লেখা পত্র, রাবওয়া থেকে প্রকাশিত)**

অতঃপর হযরত আলী (রা.)'র সম্মান ও পদমর্যাদার বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "তিনি (অর্থাৎ হযরত আলী) রাযিআল্লাহু আনহু খোদাভীরু, নির্মলচিত্ত এবং রহমান খোদার দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় লোকদের একজন ছিলেন। তিনি জাতির মনোনীত ও যুগের নেতৃস্থানীয় মানুষ ছিলেন। তিনি প্রবল শক্তিধর খোদার বিজয়ী সিংহ, স্নেহশীল খোদার বীর যুবক, দানশীল, পবিত্র হৃদয় এবং এমন অনন্য সাহসী ছিলেন যে, গোটা শত্রুবাহিনী তাঁর মুখোমুখি হলেও রণাঙ্গনে তিনি নিজের স্থান পরিত্যাগ করতেন না। তিনি সারাটা জীবন দারিদ্র্যের মাঝে কাটিয়ে দিয়েছেন। (নিজ যুগে) মানুষের জন্য নির্ধারিত তাক্বওয়ার পরম মার্গে তিনি উপনীত ছিলেন। (খোদার পথে) ধনসম্পদ ব্যয়, মানুষের কষ্ট লাঘব, এতীম-মিসকীন ও প্রতিবেশীর দেখাশোনা করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রে। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি বহুমুখী বীরত্ব ও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তির ও অসি চালনায় তাঁর হাতে বিস্ময়কর সব ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। একইসাথে তিনি ছিলেন অতি মিষ্টভাষী ও বাগ্মী। তাঁর বক্তৃতা মানব হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নিত আর এর কল্যাণে মনের মরিচা দূর হতো আর (তাঁর) যুক্তির আলোয় (শ্রোতার) চেহারা আলোকিত হতো। তিনি (তাঁর) বক্তৃতায় বিভিন্ন ধরণের পারদর্শীতা প্রদর্শন করতেন। এসব বিষয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ ব্যক্তিকে পরাজিতের ন্যায় তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হতো। সকল গুণে, বক্তব্যের গভীরতা ও বাগ্মিতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মানব। যে-ই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করেছে সে-ই নির্লজ্জতার পথ অবলম্বন করেছে। তিনি নিরূপায় লোকদের প্রতি সহমর্মিতায় অনুপ্রাণিত করতেন এবং স্বল্পেতুষ্ট মানুষ ও শোচনীয় অবস্থায় জর্জরিত লোকদের আহার করানোর নির্দেশ দিতেন। তিনি ছিলেন খোদার একজন নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। এর পাশাপাশি তিনি ছিলেন কুরআনের জ্ঞান আহরণকারীদের মাঝে একজন শীর্ষস্থানীয় মানুষ। কুরআনের সূক্ষ্ম জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁকে অসাধারণ বুৎপত্তি দান করা হয়েছিল। আমি তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় নয় বরং জাগ্রত অবস্থায় কাশ্‌ফে দেখেছি। এরপর (সেই অবস্থায়) তিনি আমাকে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি তফসীর প্রদান করেন

এবং বলেন, এটি আমার তফসীর আর এখন এটি আপনাকে প্রদান করা হল। এ পুরস্কার আপনার জন্য কল্যাণকর হোক। {অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) এই তফসীর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদান করেন এবং বলেন, আপনাকে যা দেওয়া হয়েছে এর জন্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি।} হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তখন আমি আমার হাত বাড়িয়ে সেই তফসীরটি গ্রহণ করি আর দানশীল ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আর আমি তাঁকে ঋজুকায় ও বলিষ্ঠ দেহ, উন্নত চরিত্রসম্পন্ন, বিনয়ী ও হাস্যোজ্জ্বল চেহারার অধিকারী দেখতে পেয়েছি। আর আমি কসম খেয়ে বলছি, তিঁনি আমার সাথে একান্ত স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে সাক্ষাৎ করেন। আর আমার হৃদয়ে এ ধারণা সঞ্চার করা হয় যে, তিঁনি আমায় ও আমার বিশ্বাস সম্পর্কে জানেন। মতবাদ ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমি শিয়াদের সাথে যে মতভেদ রাখি তা-ও তিনি জানেন, কিন্তু তিঁনি কোন ধরণের অসন্তুষ্টি বা বিরক্তি প্রকাশ করেন নি আর (আমার কাছ থেকে) মুখ ফিরিয়েও নেন নি। বরং তিঁনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং একনিষ্ঠ প্রেমিকের ন্যায় আমায় ভালোবাসেন আর স্বচ্ছ হৃদয়ের মানুষের ন্যায় ভালোবাসা প্রকাশ করেন। আর তাঁর সাথে, {অর্থাৎ হযরত আলী (রা.)-এর সাথে} হযরত হোসাইন বরং হাসান ও হোসাইন (রাযি.) উভয়ই এবং নবীকুল শিরোমনি খাতামান্ নবীঈন (সা.)ও ছিলেন। তাদের সাথে একজন একান্ত সুদর্শন, পূণ্যবতী, মহীয়সী, পবিত্র, নির্মল ও সম্মানীয়া, গাম্বীর্যপূর্ণ এবং ভেতরবাহির মূর্তিমান জ্যোতির্ময় এক যুবতী মহিলাও ছিলেন। তাঁকে আমি দুঃখে ভারাক্রান্ত দেখেছি। কিন্তু তিনি স্বীয় দুঃখ গোপন করছিলেন। আমার হৃদয়ে এ ধারণার উদ্রেক করা হয় যে, তিঁনি হলেন, ফাতেমাতুয্ যাহরা (রা.)। আমার শায়িতাবস্থায় তিঁনি আমার কাছে আসেন এবং (পাশে) বসেন আর আমার মাথা তাঁর রানের ওপর রেখে স্নেহ প্রকাশ করেন। আর আমি দেখলাম, আমার কোন দুঃখের কারণে তিনি দুঃখিত ও ব্যথিত। আর সন্তানের কষ্টের সময় মায়েরা যেভাবে ব্যাকুল হয়ে যায় তিনিও সেভাবে স্নেহ, ভালোবাসা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করছেন। {এ বিষয়েও কোন কোন অ-আহমদী বন্ধু আপত্তি উত্থাপন করে যে, দেখ দেখ! কতবড় বাজে কথা বলে বসেছেন! (তিনি ফাতেমার) রানে মাথা রেখেছেন; অথচ এখানে তিনি (আ.) মায়ের উপমা দিয়েছেন। আর এর পূর্বে যেসব কথা বলেছেন, যেসব বৈশিষ্ট্যের অবতারণা করেছেন– তা মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন এরপর এই বাক্যটি লক্ষ্য করুন যে, মায়ের মতো স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়েছেন; তাহলেই সমস্ত আপত্তি নিরসন হয়ে যায়, কিন্তু তাদের মানসিকতা নোংরা তাই এদের মাথায় আপত্তি দানা বাঁধতে থাকে। যাহোক, এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,} এরপর আমাকে বলা হয়েছে, ধর্মের ক্ষেত্রে আমি তাঁর কাছে ছেলে সদৃশ। আমার মনে ধারণার উদ্রেগ হল, জাতি, স্বদেশবাসী ও শত্রু কর্তৃক আমি যে অত্যাচারের সম্মুখীন হতে যাচ্ছি সেটিই তাঁর (তথা হযরত ফাতেমার) দুঃখের কারণ। এরপর আমার কাছে হযরত হাসান ও হোসাইন (রাযি.) এলেন। তাঁরাও সহোদরের ন্যায় ভালোবাসা প্রকাশ করতে থাকেন এবং দুই সহমর্মির মতো আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এটি ছিল জাগ্রত অবস্থায় একটি দিব্যদর্শন। আমি এ কাশফ্ দেখেছি বেশ কয়েক বছর হয়েছে। হযরত আলী (রা.) এবং হোসাইন (রা.)'র সাথে আমার অতি সূক্ষ্ম একটি মিল রয়েছে, যার রহস্য পূর্ব-পশ্চিমের প্রভু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আমি হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর উভয় পুত্রকে ভালোবাসি। আমি তাকে শত্রু মনে করি যে তাঁদের প্রতি শত্রুতা রাখে। এতদসত্ত্বেও আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। আল্লাহ্ আমার সামনে যা প্রকাশ করেছেন তা আমি উপেক্ষা করতে পারি না। আর আমি সীমালঙ্ঘনকারীও নই। তোমরা যদি না মানো তাহলে আমার কর্মের জন্য আমি দায়ী আর তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী। আর আল্লাহ্ সত্ত্বর তোমাদের এবং আমার মাঝে অবশ্যই মীমাংসা করবেন। তিনি সকল মীমাংসাকারীর মাঝে সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।" (সির্‌রুল

খিলাফা, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮-৩৫৯, সির্‌রুল খিলাফার উর্দূ অনুবাদ, পৃঃ ১০৮-১১২, নাযারাতে এশায়াত, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়া, পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত)

আজ এখানেই হযরত আলী (রা.)'র স্মৃতিচারণ সমাপ্ত হচ্ছে; আগামীতে পরবর্তী স্মৃতিচারণ আরম্ভ হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি এই ঘোষণাও দিতে চাই যে, নামাযের পর আমি নতুন একটি টিভি চ্যানেল উদ্বোধন করব, ইনশাআল্লাহ্, যেটি এমটিএ ঘানা নামে চব্বিশ ঘন্টা সম্প্রচারিত হবে। ২০১৭ সালে ঘানায় ওয়াহাব আদম স্টুডিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ঘানার প্রাক্তন আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ প্রয়াত আব্দুল ওয়াহাব আদম সাহেবের নামে এর নামকরণ করা হয়েছিল। যাহোক, এমটিএ আফ্রিকার চ্যানেলগুলোর বর্তমান অনুষ্ঠানমালার ৬০ শতাংশ এই স্টুডিওতে নির্মিত হয়। এই স্টুডিওতে সার্বক্ষণিক সতেরজন কর্মী নিয়োজিত রয়েছে এবং বিভিন্ন বিভাগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেচ্ছাসেবীও রয়েছে ষাটের অধিক। ঘানার অত্যাধুনিক স্টুডিওগুলোর মধ্যে ওয়াহাব আদম স্টুডিও অন্যতম আর এতে বেশ কিছু উন্নত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে; বিভিন্ন মিডিয়া কর্তৃপক্ষ এবং ব্রডকাস্টাররা প্রশিক্ষণ ও কাজের অভিজ্ঞতার জন্য তাদের কর্মীদেরকে এই স্টুডিওতে পাঠায়। এই স্টুডিও অনেক সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেছে, যার মধ্যে আফ্রিকার প্রথম পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা এবং পবিত্র রমযানের (বিশেষ) সম্প্রচার অন্যতম। এমটিএ ঘানা নামে এখন একটি নতুন চ্যানেল উদ্বোধন করা হচ্ছে। এটি ঘানায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে চব্বিশ ঘন্টার নতুন দেশীয় টিভি চ্যানেল হবে। এমটিএ ঘানা (চ্যানেলটি) স্যাটেলাইট ডিশ ছাড়াই যেকোন সাধারণ টিভি এন্টেনার মাধ্যমেও দেখা যাবে। এর অর্থ হল, ঘানার মানুষ সহজেই সাধারণ এন্টেনার মাধ্যমেও এই চ্যানেল দেখতে পারবে। এই চ্যানেল সেসব স্থানে বা লোকেশনেই সহজলভ্য হবে, যেখানে ঘানার বড় বড় চ্যানেলগুলো দেখা যায়; আর এভাবে দেশের সর্বত্র লক্ষ লক্ষ বাড়িতে এটি পৌঁছে যাবে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল এটি কভার করবে, ইনশাআল্লাহ্। ওয়াহাব আদম স্টুডিও থেকে ঘানার বিভিন্ন ভাষাতেও অনুষ্ঠান প্রস্তুত করা হবে, যার মধ্যে ইংরেজি, চুই, গা, হাউসা এবং অন্যান্য ভাষা অন্তর্ভুক্ত। সেখানে লাজনার স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য টীম চ্যানেলের ট্রান্সমিশন ও শিডিউলিং এর দায়িত্ব পালন করবে। (এখানে) নৈতিক, শিক্ষণীয় এবং সংশোধনমূলক অনুষ্ঠানসমূহ প্রস্তুত করা হবে। এ চ্যানেলের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের সঠিক ও অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা হবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। এমটিএ ঘানা সারা দেশে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ইসলামী শিক্ষামালা প্রচারে পুরোপুরি নিবেদিত একমাত্র ফ্রি চ্যানেল হবে, ইনশাআল্লাহ্। আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা এক স্থানে পথ বন্ধ করার চেষ্টা করে আর আল্লাহ্ তা'লা অপর স্থানে অন্যান্য রাস্তা খুলে দেন। এই হল, জামা'তের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ। বন্ধ পথগুলোও সময়মতো খুলে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এর পাশাপাশি আমাদেরকে আনন্দের উপকরণও দান করেন। এই চ্যানেল এই দেশকে কভার করবে, বরং সম্ভবত প্রতিবেশী কিছু অঞ্চলকেও কভার করবে। আমি যেমনটি বলেছি, জুমুআর নামাযের পর আমি এর উদ্বোধন করব ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

দ্বিতীয় বিষয় হল, যেভাবে আমি আজকাল মনোযোগ আকর্ষণ করছি, বিশেষভাবে পাকিস্তান ও আলজেরিয়ার বন্দীদের জন্য দোয়া করুন; আল্লাহ্ তা'লা তাদের মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন। পাকিস্তানের সার্বিক পরিস্থিতির জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সেখানে আহমদীদের শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন। আহমদীয়াতের বিরোধীদের বিবেক-বুদ্ধি দিন; আর যদি তা না হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে যে আচরণ করতে চান করুন; আমরা যেন তাদের (খপ্পর) থেকে শীঘ্র মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হই। আমাদের এবং বিশেষভাবে স্বয়ং পাকিস্তানের আহমদীদেরও বর্তমানে দোয়া, নফল ইবাদত ও

দান-খয়রাতের প্রতি জোর দেয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার চাদরে আবৃত করে রাখুন। (আমীন)

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১, পৃঃ ৫-১০)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)